সংবাদমন্থনের পর্যালোচনা সভা

স্থান বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর
(গাছতলা), বড়তলা, কলকাতা ১৮।
১৯ আগস্ট রবিবার বেলা দুটোয়

যোগাযোগ জিতেন নন্দী (০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬)
পাঠক, পত্রিকা কর্মীরা সবাই আসুন

খবরের কাগজ

সংবাদমন্থন

Vol 4 Issue 3 1 August 2012 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

চতুর্থ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা ১ আগস্ট ২০১২ বুধবার ২ টাকা

• স্বশাসন পৃ ২ • ক্ষতিপূরণ পৃ ২ • মানেসরের ডায়েরি পৃ ৩ • পুকুর ভরাট পৃ ৩ • জাল কারবার পৃ ৩ • পঞ্চমন্দির পৃ ৪ • জাপান পৃ ৪ • স্মরণ পৃ ৪

দিঘিড়পার বাজার থেকে আলমবিবি যাওয়ার পথে রাস্তার ডান দিকে ১৩ শ্রাবণ তোলা। বীজতলা করা অথচ জলের অভাবে রুইতে পারছেন না, এখানে রাস্তার কাজের জন্য মাটি কেটে খালা করা অংশে আগের দিনের বৃষ্টিতে জল জমলে তলার মাটি এত শক্ত যে টেনে তুলতে গেলে ছিঁড়ে যাচ্ছে। ডায়মন্ড হারবার রোডের কাছে এই মাঠের বেশির ভাগ জমি বিক্রি হয়ে গেছে।

ফলতার ন'পুকুরিয়া অঞ্চলে মাদ্রাসার মোড়ের সামনে তোলা মাঠে আগে পুরোটাই চাষ হত। এ বছর কিছুটা হাল হয়েছে, বাকিটা এখনও হয়নি (১৩ শ্রাবণ)। এখানে মানুষ রিক্সা টানা, মশারির ব্যবসা করলেও চাষের, বিশেষত ধান চাষের ওপর সম্বৎসরে ভরসা করে থাকে, অথচ এই অঞ্চল নয়া সবুজ বিপ্লবের কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প বিজিআরইআই–এর আওতায় পড়েনি।

সুজাপুরে রাস্তার ধারের জমি বিক্রি হয়ে গিয়ে খালের ওপর দিয়ে কালভার্ট হয়েছে। যারা একলপ্তে অনেকটা জমির মালিক, তারা আর চাষ করে না, অন্যকে দিয়ে চাষ করায়। বিনিময়ে টাকা নেয়। এবারে ধানের বাজারদর কম, লোকে টাকা দিতে পারবে সেই ভরসা করা যাচ্ছে না, তাই দাম ভালো পেলে কোম্পানির কাছে জমি বিক্রি করে দিচ্ছে।

ফলতা ব্লকের আমন ধান চাষের ছবি তুলেছেন পার্থ কয়াল। আরও ছবি ও রিপোর্ট তিনের পাতায়।

এই সপ্তাহে বৃষ্টি না হলে আমন চাষ শেষ হয়ে যাবে

প্রবীর হালদার, মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৬ জুলাই •

আমাদের পাঁচ বিঘা মতো জায়গা আছে। আষাঢ় মাসের ৭ তারিখ পর্যন্ত দুধেশ্বর বীজধানটা ফেলা হয়েছে। বীজতলা আমরা নিজেরাই করি। ২৫ তারিখের মধ্যে বীজতলাটা বড়ো হয়। সেটাকে মাঠে ট্রাক্টর বা গরুর হাল দিয়ে বোনা হয়। এবছর যা অবস্থা, শ্রাবণ মাসের ১০ তারিখ হয়ে গেল, যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন এখনও পর্যন্ত তার এক সিকি পর্যন্ত জল নেই। চার কড়া মতো (জমির ওপর এক ইঞ্চি) জল ছিল জমিতে, তাতে বীজতলাটা বোনা গেছে। বৃষ্টি হচ্ছে না। জলটা প্রচণ্ড গরমের জন্য কমেও যাচ্ছে। গাছগুলো লাল হয়ে যাচ্ছে। এর কোনো ওষুধেও কাজ হবে না, সার দিলেও বাঁচবে না। একমাত্র এর প্রয়োজন জল।

আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে যদি জল হয়, তাহলে ইউরিয়া, সুফলা আর ডিএপি দিয়ে গাছটাকে স্ট্রং করা যাবে। এর মধ্যে যদি বৃষ্টি না হয়, তাহলে একেবারে শেষ হয়ে যাবে। এখন লোকের ২০০ টাকা মজুরি।

এরপর দুয়ের পাতায়

আসামে ভয়াবহ জাতিদাঙ্গা, উদ্বাস্তু কয়েক লক্ষ মানুষ, নিহত এবং আহত শত শত

বোড়ো বনাম অ–বোড়ো
বঞ্চনা থেকে সংঘর্ষে

তাপস দাস, গৌহাটি, আসাম, ৩০ জুলাই •

১৯৬২ সালে বোড়ো ভাষার দাবিতে একটা বড়ো আন্দোলন হয়। দাবি ছিল বোড়ো ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে বোড়ো যুবকদের হত্যা করে। 'প্লেন্স ট্রাইবাল কাউন্সিল অব আসাম' নামে একটি জনজাতি সংগঠন গড়ে উঠেছিল আসামে, তাদের নেতৃত্বেই আন্দোলনটা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৫ আসাম আন্দোলন হল। তখন বোড়ো বা জনজাতিরা আসাম আন্দোলনকেই সমর্থন করেছিল।

কিন্তু 'অল আসাম স্টুডেন্ট্স ইউনিয়ন' থেকে 'অসম গণ পরিষদ' হয়ে যখন সরকার গঠন করল, তখন এরা জনজাতি বা ট্রাইবদের ইস্যুগুলোকে গুরুত্ব দিল না। ১৯৮৭ সাল থেকে বোড়োরা পৃথক বোড়ো রাজ্যের দাবি করল। 'অল বোড়ো স্টুডেন্ট্স ইউনিয়ন' বা আবসু–র নেতৃত্বে একটা আন্দোলন গড়ে উঠল। পুলিশ ও সামরিক প্রশাসন গ্রামের পর গ্রাম গুলি চালিয়ে ফাঁকা করে দেয়। ভয়ঙ্কর অত্যাচার নামে। ১৯৯৩ সালে একটা সংঘর্ষ হয়, বোড়ো বনাম সাঁওতাল। কারণ ওই সময় একটা চুক্তি হয়েছিল সরকারের সঙ্গে, তাতে নির্দিষ্ট কোনো এলাকা বা টেরিটরি ভাগ ছিল না। তখন প্রায় দু–লাখ সাঁওতাল, মুণ্ডা, আদিবাসীরা চল্লিশটা সরকারি শিবিরে ছিল। ওই চুক্তি টিকল না। পরবর্তীকালে আবসুর জায়গায় এল বোড়ো লিবারেশন টাইগার বা বিএলটি। এদের নেতৃত্বে একটা বড়ো আন্দোলন হয়েছিল। ২০০৩ সালের ৬ ডিসেম্বর বিএলটি অস্ত্র নামিয়ে নেয় এবং শান্তির পক্ষে রায় দেয়। ২০০৩ সালে ১০ ফেব্রুয়ারি সরকারের সঙ্গে চুক্তি হল। 'বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল এরিয়াজ ডিস্ট্রিক্ট' তৈরি হল। স্বশাসিত 'বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল' কিছু ক্ষমতা পেল।

একসময় বোড়োরা সরল সাদাসিধে ছিল। কোনো বোড়ো গাঁওবুড়াকে গিয়ে অন্য গোষ্ঠীর মানুষ যদি বলত, আমি খেতে পাচ্ছি না, তাকে বলা হত, যা পাঁচ বিঘা জমি নিয়ে থাক। কেউ বলল, গরু নাই, তাকে একজোড়া হালবলদ দিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু পরে অর্থনৈতিক সঙ্কট বাড়ল। জমির চাহিদা বেড়ে গেল। আজ বলা হচ্ছে, তোমরা চলে যাও।

এই কাউন্সিলের এলাকার মধ্যে কতকগুলো গ্রাম ঢুকেছে, কতকগুলো ঢোকেনি। বোড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলে ২০১১ সালে দেখা যাচ্ছে, কোকরাঝাড় বাকাসা চিরাঙ্গ ও উদালগুড়ি মোট চারটি জেলায় ৩১ লক্ষের কিছু বেশি। ২০০১ সালে ছিল এর ৫০%। এই বোড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলের ৩০০০–এর বেশি গ্রামের মধ্যে ৯৫টা গ্রামে ১–২% বা তারও কম বোড়ো জনজাতির লোক আছে। এইসব গ্রামে বোড়ো বনাম অ–বোড়ো দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। এই অ–বোড়ো সম্প্রদায়ের মধ্যে আদিবাসী সাঁওতাল–মুণ্ডা আছে, রাভা আছে, কোচ–রাজবংশী আছে, মুসলমান আছে, ৩০–৪০–৫০ বছর আগে আসা বাংলাদেশের মানুষও আছে।

এদিকে বোড়োরা আরও কিছু গ্রাম তাদের অঞ্চলের মধ্যে চাইছিল। আদিবাসী বনাম জনজাতি একটা সংঘাত আগে থেকেই ছিল। 'অল আসাম মাইনরিটি স্টুডেন্ট্স ইউনিয়ন' বা আমসু–র নেতৃত্বে মুসলমানরাও নিজেদের বঞ্চনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছিল। ফলে বোড়ো বনাম অ–বোড়ো সংঘাত বাড়ছিল। বোড়োরা পৃথক বোড়োল্যান্ডের দাবি করছিল।

গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনে যেমন আরও গ্রাম, আরও এলাকার দাবি এসেছে, একই জিনিস বোড়োল্যান্ড আন্দোলনেও দেখা গেছে। তবে গোর্খাল্যান্ডের ক্ষেত্রে যেমন অ–গোর্খার বিপরীতে বাঙালি, এখানে অ–বোড়ো সমাজের কৌমগুলোকে ভাগ করা যায় না। রাভারাও আলাদা টেরিটরির দাবি করেছে। সেখানে রয়েছে রাভা বনাম অ–রাভা দ্বন্দ্ব। কিন্তু অ–বোড়ো কিংবা অ–রাভা গোষ্ঠীগুলোকে নির্দিষ্টভাবে আলাদা করা যায় না। একসময় হয়েছিল বোড়ো বনাম সাঁওতাল সংঘর্ষ। এখন দেখা যাচ্ছে বোড়ো বনাম মুসলমান দ্বন্দ্ব।

এরপর দুয়ের পাতায়

আসামে জাতিদাঙ্গা বন্ধের দাবিতে কলকাতায় মিছিল

মুহাম্মদ হেলালউদ্দিন, কলকাতা, ৩০ জুলাই •

আসামে জাতিদাঙ্গা বন্ধের দাবিতে মিছিল। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আসাম রাজ্যের কোকরাঝাড়, চিরাং, ধুবড়ি, বঙ্গাইগাঁও সহ কয়েকটি জেলায় বোড়ো উগ্রপন্থীরা অত্যাধুনিক অস্ত্রের মাধ্যমে বেপরোয়া গুলি চালিয়ে এবং গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে চলেছে। কয়েক লক্ষ মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে, নিহতের সংখ্যা সরকারি হিসেবে পঞ্চাশের মতো, আর বেসরকারি মতে কয়েকশ'। এই বর্বরোচিত জাতি নির্মূলীকরণ সূচক আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং বিতাড়িত, উৎখাত হওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের নিরাপত্তা, ত্রাণ, ক্ষতিপূরণ, এবং পুনর্বাসনের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত 'ফোরাম ফর পিস এন্ড হারমোনি'–র উদ্যোগে ২৭ জুলাই শুক্রবার দুপুর ২টায় কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসা (হাজি মহম্মদ মহসিন) এর সামনে থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত এক মৌন মিছিলের আয়োজন করা হয়। ধর্মতলার ওয়াই ক্রসিং–এ মিছিল পৌঁছনোর পর পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ফোরামের আহ্বায়ক আইনজীবি আনিসুর রহমান সহ প্রতিটি সংগঠনের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। এরপর এক প্রতিনিধিদল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন ফোরামের আহ্বায়ক আনিসুর রহমান, সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অব ইন্ডিয়া–র রাজ্য সভাপতি তাহেদুল ইসমাল, 'নয়া জমানা'র আবদুর রশিদ মোল্লা প্রমুখ, পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া, কম্পাস ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া, বাংলার মুক্তিমঞ্চ, মুসলিম সংরক্ষণ মোর্চা। বন্দীমুক্তি কমিটির ছোটন দাস, সারা বাংলা সংখ্যালঘু কাউন্সিলের মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, সারা বাংলা মুসলিম থিংক ট্যাঙ্কের শাহ আলম প্রমুখ মিছিলে পা মেলান।

এরপর দুয়ের পাতায়

জলপাইগুড়ি জেলায় উদ্বাস্তু শরণার্থী শিবির থেকে

তাহেদুল ইসলাম, মোমিনপুর, জলপাইগুড়ি, ৩১ জুলাই •

সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অব ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে আমরা চারজনের একটি প্রতিনিধিদল আজ ৩১ জুলাই জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার দুই নম্বর ব্লকের মোমিনপুর আশ্রয়শিবির পরিদর্শন করলাম। এই আশ্রয়শিবির গড়ে উঠেছে মোমিনপুর মসজিদ এবং আকবর শিশু বিকাশ অ্যাকাডেমিতে, মোট এক হাজার উনসত্তর জন লোক এখানে বসবাস করছে। এরা সবাই আসামের কোকড়াঝাড় জেলার লোক। এর মধ্যে রয়েছে শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধা যুবক যুবতী সবাই। আমরা যখন দুপুর বারোটার সময় ওখানে পৌঁছলাম, দেখলাম পঁয়ষট্টি বছরের একজন বৃদ্ধ, তিনি আমাদের জানালেন, তিনি সকালবেলায় চা আর একটা বিস্কুট খেয়েছেন। এখন পর্যন্ত আর কিছু খাবার পাননি। আর একজন শতবর্ষ পার হওয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, আমি রোজা রেখেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি খেয়ে রোজা রেখেছেন? উনি বললেন, একখানা বিস্কুট আর পানি খেয়ে রোজা রেখেছি। আশ্রয়শিবিরে উপস্থিত ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ বলল, সকাল থেকে কিছু খায়নি, কেউ বলল, চা বিস্কুট খেয়েছে।

আমরা ওখানে থাকাকালীনই শুনলাম, কংগ্রেসের বিধায়ক মৌসম বেনজির নূর আসবেন। এখানে সেই উপলক্ষে অনেক নেতা এসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত উনি এলেন না। দুটোর সময় খাবার দেওয়া শুরু হতেই বিরাট লাইন পরে গেল। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোর পাতে খাবার পড়ল। চেয়ে দেখলাম, ভাত আর ডাল। কারও কারও পাতে সয়াবিন। আমরা জিজ্ঞেস করতে সবাই বলল, আমরা সাতদিন ধরে এই খাবারই খাচ্ছি শুধু। কখনও কখনও টিফিন পাওয়া যাচ্ছে। দুপুর দুটো নাগাদ ভাত, কোনওদিন ডাল থাকছে, কোনওদিন তরকারি থাকছে।

আশ্রয়শিবিরের লোকজন জানাল, সরকারের তরফে অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও আশ্রয়শিবিরের হাল বেশ খারাপ। রাজনৈতিক দলের নেতারা আসছেন যাচ্ছেন, কিন্তু তারা মূলত লোক দেখাতেই ব্যস্ত। আমাদের জন্য কিছু করছেন না। এই মুহূর্তে এক হাজারের ওপরে মানুষ, মাত্র তিনখানা ঘরে বসবাস করছি। পুরুষরা বেশিরভাগই রাত্রে গাছতলায় থাকছে। আরও অন্তত দু–তিনটে ঘর না হলে সমস্যা। আর আমাদের খাবারের ভীষণ প্রয়োজন। কিছু মানুষ আমরা রোজা রাখতে চাইছি, কিন্তু ভোর রাতে বা সন্ধ্যের সময় খাবার পাচ্ছি না। আর আমাদের পোশাকেরও দরকার। আমরা এক কাপড়ে এসেছি। কোনও পোশাক নিয়ে আসতে পারিনি।

আপনারা কি আপনাদের ঘরে ফিরে যেতে চাইছেন? — এ প্রশ্নের জবাবে তারা জানালেন, আমরা ফিরে যেতে চাই, কিন্তু ফিরে যাওয়ার মতো কোনও পরিস্থিতি দেখছি না। আমরা খুব ভয়ে আছি।

এরপর দুয়ের পাতায়

মারুতি শ্রমিকের হিংসা

২১ জুলাই কাফিলা ডটকম–এ অনুমেহা যাদবের রিপোর্ট থেকে নেওয়া •

১৮ জুন বুধবার সন্ধ্যায় মারুতি গাড়ি কোম্পানির মানেসর প্ল্যান্টে এক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। সেদিন সকালে ফ্যাকট্রির অ্যাসেম্বলি ফ্লোরে কর্মরত জিয়া লাল নামে একজন স্থায়ী শ্রমিককে কাজ থেকে সাসপেন্ড করা হয়। যতদূর জানা গেছে, সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ যখন জিয়া লাল এবং আরও কয়েকজন চায়ের বিরতির পর কাজের জায়গায় ফিরছিলেন, রাম কিশোর মাজি নামে একজন সুপারভাইজার তাঁদের দাঁড় করিয়ে বলেন, শিফ্ট শুরুর আগের মিটিংয়ে তাঁদের থেকে যেতে হবে। ওঁদের মধ্যে তর্ক হয়। তখন সেই সুপারভাইজার জিয়া লালকে চেঁচিয়ে জাত তুলে গালাগালি দেন এবং তাতে কিছুটা কথা কাটাকাটি হয়। জিয়া লাল একজন দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁকে সাসপেন্ড করলেও সুপারভাইজারকে তাঁর ব্যবহারের জন্য কোনো শাস্তি না দিয়ে কয়েকদিনের জন্য ছুটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শ্রমিকেরা জিয়া লালের সাসপেনশন তুলে নেওয়ার দাবি করে।

কয়েকদিন থেকেই শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। গত এপ্রিল মাসে ইউনিয়নের নতুন নেতৃত্ব আসার পর থেকে ম্যানেজমেন্ট তাদের বিশেষ পাত্তা দিচ্ছিল না। ইউনিয়ন যে দাবিসনদ দিয়েছিল, তার ওপর মার্চ মাস থেকে ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চলছিল। ম্যানেজমেন্টের বেতন সংক্রান্ত ঘোষণার পর সোমবার আলোচনা থেমে যায়। মারুতি প্ল্যান্টগুলিতে প্রত্যেক শিফ্ট শুরুর আগে ২০ মিনিটের একটা সভা হয়, সেখানে শ্রমিক এবং বাবুরা সকলে কিছু ব্যায়ামও করে। আগের দিন অর্থাৎ ১৭ জুন মঙ্গলবার শ্রমিকেরা সকালে ওই মিটিংয়ে অংশ নিতে অস্বীকার করে।

এরপর দুয়ের পাতায়

সূর্যের ছন্দে চলো!

আমাদের উত্তরাখণ্ডের বাসায় একটা ছোটো বহনযোগ্য সৌরকোষ আছে। সেটা একটা ব্যাটারিকে চার্জ করে, আবার তা থেকে সরাসরি বিদ্যুৎও পাওয়া যায়। দিনের বেলায়, আকাশে মেঘ থাকলেও আমি ব্যাটারিটা চার্জ করে নিতে পারি, আর ফোন ল্যাপটপ ইত্যাদি চালাতে পারি। সূর্য ডুবলে সেই ব্যাটারিতে প্লাগ গুঁজে দিই। কিন্তু আমি পছন্দ করি সূর্যের ছন্দে চলতে। রাতে সূর্য ডুবে গেলে একটু আগুনের পাশে গোল হয়ে বসে আশেপাশের মানুষদের সাথে গল্প করা ... নিজের সাথে গল্প করা ...। তারপর শান্তির ঘুম ...। আমি জানি শহরের জীবন বেশ আলাদা। এখানে আমার আমেরিকার জীবনের মতো। কিন্তু সূর্য থেকে আমরা যেটুকু পাই, সেটুকু শক্তিই হয়তো আমাদের দরকার!

৩০ এবং ৩১ জুলাই সারা দেশের অর্ধেকের বেশি জায়গায় বেশ কিছুক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ ছিল না। রেললাইন থেকে মেট্রো, এমনকী হাসপাতালের জরুরি পরিষেবাও স্তব্ধ হয়ে যায় বিভিন্ন শহরে। জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডের আগ্রার কাছের কোনো একটি অংশে বিপর্যয়ের কারণে, এবং তারপর আঞ্চলিক বিদ্যুৎ ঘাটতি এড়াতে একের পর এক শহর তথা রাজ্যের বেশি বিদ্যুৎ টানার চেষ্টা — সব মিলিয়ে দেশের বৃহত্তম বিদ্যুৎ বিপর্যয় এটি। ইন্টারনেটের সামাজিক পরিসরে এই সংক্রান্ত বিষয়ে কথোপকথনের সময় আমেরিকা প্রবাসী উত্তরাখণ্ডের মেয়ে আইকতা সুরি ধিলোঁ–র গ্রিড–বিহীন, স্বাবলম্বী সৌর শক্তি ব্যবহারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা।

সম্পাদকের কথা

মারুতি কারখানায় দলবদ্ধ শ্রমিকের হিংসা

গুরগাঁওয়ের মানেসরে মারুতি মোটরগাড়ি কারখানার ম্যানেজারেরা দলবদ্ধ শ্রমিকের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধের শিকার হয়েছেন। একজন ম্যানেজারকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এই ঘটনা দুঃখজনক এবং নিন্দনীয়ও বটে।

কিন্তু কেন এমন ঘটল? এর পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যপূর্ণ উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। দলবদ্ধ শ্রমিকের এরকম মারমুখী চেহারা অবশ্য পশ্চিমবঙ্গেও কখনো কখনো দেখা গেছে। সাধারণ ছাপোষা শ্রমজীবী মানুষের দপ করে জ্বলে ওঠা আগুনের মতো হিংস্র চেহারা আমাদের একেবারে অপরিচিত নয়।

মারুতি–সুজুকি ভারতের সবচেয়ে বড়ো মোটরগাড়ি কোম্পানি। এর মালিকানার মূল নিয়ন্ত্রণ জাপানি সুজুকি কোম্পানির হাতে। এই কোম্পানির প্ল্যান্টগুলোতে কিছুটা অভিনব হলেও অত্যন্ত সংগঠিত ও আধুনিক কায়দায় শ্রমিকদের কম পয়সায় বেশি উৎপাদন করিয়ে নেওয়া হয়। গত ত্রিশ বছরে কোম্পানির এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা সংগঠিত শীতল হিংসা রয়েছে। তার বহিঃপ্রকাশ সামান্যই। শ্রমিকদের তুই-তোকারি-গালিগালাজ আর কলার চেপে ধরা তো রয়েছেই। ঠিকা শ্রমিকদের সামান্য 'বেআদবি' দেখলে নিঃশব্দে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়।

এই সুসংগঠিত ও লাগাতার দমনের সামনে দীর্ঘকাল শ্রমিকেরা ছিল অসহায়। ২০০০ সাল থেকে ম্যানেজমেন্টের পোষা একটা ইউনিয়ন শ্রমিকদের মাথার ওপর চেপে বসেছিল। এগারো বছর সেই ইউনিয়নের কোনো নির্বাচন হয়নি। শ্রমিকেরা নিজেদের উদ্যোগে একটা স্বাধীন ইউনিয়ন করতে চাইল। কিন্তু সরকার রেজিস্ট্রেশনের আবেদন নাকচ করে দিল। এই অবস্থায় গত বছর জুন মাসে ১৩ দিন স্থায়ী ও ঠিকা শ্রমিক এবং ট্রেনি–কর্মীরা একত্রে মানেসর কারখানা দখল করে রাখে। এরপর কোম্পানি একটা গুড কন্ডাক্ট বন্ডে শ্রমিকদের জোর করে সই করিয়ে নিতে চায়। শ্রমিকেরা তা প্রত্যাখ্যান করে। ঠিকা শ্রমিকদের কাজে ঢুকতে না দিলে অক্টোবর মাসে আবার কারখানা দখল করে শ্রমিকেরা। এবার এই কারখানা–দখল আন্দোলনে যোগ দেয় আশপাশের আরও দশটি কারখানার শ্রমিক। এবার কোম্পানি নতুন চাল দেয়। তারা গোপনে নবগঠিত স্বাধীন ইউনিয়নের নেতাদের হাত করে ফেলে। হঠাৎ শ্রমিক–নেতারা চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে যায়। শ্রমিকেরা অগত্যা তড়িঘড়ি নতুন নেতা স্থির করে।

কিন্তু আইনসম্মতভাবে সামান্য সংগঠিত হতে না দেওয়ার ঘটনা শ্রমিকদের ক্ষোভ বাড়িয়ে তোলে। সামান্য ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারটুকুও না দেওয়ার এই রেওয়াজ গুরগাঁও শিল্পাঞ্চলে রয়েছে। এবছর মার্চ মাসে এখানকার ওরিয়েন্ট ক্রাফট কারখানায় (ভারতের সবচেয়ে বড়ো পোষাক তৈরির সংস্থা) একজন লেবার কন্ট্রাক্টর একজন শ্রমিককে কাঁচি নিয়ে আক্রমণ করে। সেই ঘটনায় কারখানার বিশ হাজার শ্রমিক ভয়ানক উন্মত্ত হয়ে ওঠে। আর একটি ঘটনায় একজন নির্মাণ–শ্রমিক কাজ করতে করতে সাততলা থেকে পড়ে যায়। আশপাশের বিভিন্ন সাইট থেকে এক হাজারের বেশি নির্মাণ–শ্রমিক জড়ো হয় এবং নির্মাণ কোম্পানির অফিসে চড়াও হয়।

অতএব মারুতির ঘটনা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। ক্ষমতাহীন মানুষের সামান্য প্রতিবাদ করার সুযোগটুকুও যদি কেড়ে নেওয়া হয়, যদি দিনের পর দিন সংগঠিত ক্ষমতার হুমকি আর দমনের পরিবেশে তাকে মুখ বুজে কাজ করতে হয়, তাহলে তার ধৈর্যের বাঁধ কখনো কখনো ভেঙে পড়তে পারে। তখন ঘটতেও পারে ক্ষমতাহীনদের দলবদ্ধ হিংসার ঘটনা।

'তোমরা আসো এক হাতে বন্দুক আর অন্য হাতে গুড় নিয়ে, বাহ্!'

সরকারি সাহায্য প্রত্যাখ্যান করল সারকেগুড়ার গ্রামবাসীরা

(বাঁয়ে) 'আমরা তোমাদের রেশন–পানি চাই না, কোনো মদত চাই না তোমাদের', বলছেন হিন্দি জানা এক গ্রামবাসী মেয়ে। (মাঝে) বাচ্চা কোলে নিয়ে অফিসারদের সাথে কথা বলছেন গোনডি ভাষায়। (ডানে) রেশন ক্যাম্প না করেই তাঁবু খুলে ফেলা হচ্ছে।

ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে ২৮ জুন সিআরপিএফ গ্রামে ঢুকে গুলি চালিয়ে ১৭ জন নিরস্ত্র কমবয়সী ছেলেমেয়েকে মেরে ফেলেছিল, আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল ঘরবাড়িতে। এই গণহত্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলির একটি, সারকেগুদা–তে একটি তথ্যানুসন্ধান দল যায় ৭ জুলাই। তখন ওই গ্রামে বিশাল ক্যাম্প করে চাল ডাল বিলি করার বন্দোবস্ত করছিল স্থানীয় প্রশাসন। গ্রামবাসীরা ওই চাল ডাল নিতে অস্বীকার করে। ক্যাম্পের তাঁবু গুটিয়ে পিঠটান দেয় সরকারি অফিসাররা। তথ্যানুসন্ধান দল ওই পুরো ঘটনাটির ভিডিও রেকর্ডিং করে। সেখান থেকেই প্রতিবাদী গ্রামবাসীদের বয়ান হিন্দি থেকে অনুবাদ করে নিচে দেওয়া হল। অনুবাদ সম্পাদনা শমীক সরকার। মূল ভিডিও–তে গোনডি ভাষাতেও কিছু কথা ছিল, যা অনুবাদ করা যায়নি •

আমাদের সতেরো জন গ্রামবাসীকে মেরে, সব ঘরগুলোকে জ্বালিয়ে দিয়ে এখন রেশন–পানি–ডিম দিতে এসেছ? আমরা কি গরু বাছুর? আমাদের ছেলেমেয়েগুলো কি এই জন্য মরেছে? আমরা কি তাদের জান বিক্রি করেছি? আমাদের কি ঘরে খাবার নেই? আমাদের কি পরার কাপড় নেই?

ওরা জানত না যে আমরা নকশাল নই? যাও নকশালদের গিয়ে দাও এইসব। কোত্তাগুড়ার লোকেরা জানে না যে আমরা নকশাল নই? আপনারা কি ভেবে এনেছেন এসব? নকশালদের দেবেন বলে? ওই সতেরো জন যাদের মেরেছ, তারা তো সব আসল নকশাল ছিল! ওরা মানুষ নয়! ওরা পড়াশুনো করা বাচ্চা নয়! ওই বাচ্চা মেয়েটা ভাষণ দিচ্ছিল মণ্ডপে উঠে, তাই তো ওকেই প্রথমে মারা হল! ওই তো আসল নকশাল! ওর বয়স বারোও হয়নি। ওরা সবাই নকশাল! নকশালদের কেউ রেশন–পানি দেয়? নকশালদের তো মারতে হয়!

আপনাদের কোনো মদত আমরা চাই না। রেশন–পানি চাই না। আমাদের সবাই চেনে। আমরা বাসাগুড়ার লোক, সারকেগুড়ার লোক, কোত্তাগুড়ার লোক। চারিদিকে সব নকশালি। মেরে দাও তাহলে আমাদের! জ্বালিয়ে দাও! গাড়ি ডাকো! আমাদের লাশগুলো তুলে নিয়ে যাও! সেদিন রাতে যেমন করে গাড়িতে ঠাসাঠাসি করে ভরছিলে লাশগুলো। যারা বেঁচে ছিল তখনও, তারাও মরে গেছে ওই ঠাসাঠাসিতে।

তোমরা একহাতে বন্দুক আর অন্য হাতে গুড় নিয়ে আসো! বাহ্ রে বাহ্।

প্র থ ম পা তা র প র

বোড়ো বনাম অ–বোড়ো

একথা অনস্বীকার্য, বোড়ো জনজাতি নানানভাবে বঞ্চিত হয়েছে। ভাষার বঞ্চনা তো রয়েছেই। একটা লম্বা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ২০০৩ সালে বোড়ো ভাষা সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছিল। এটা একটা দিক। অন্যদিকে আজ ওরা অন্যদের বঞ্চনার বিনিময়ে কিছু অধিকার চাইছে। একটা সময় আইন ছিল, ট্রাইবদের এলাকায় অ–ট্রাইবরা থাকতে পারবে না। পরে সেটা সংশোধন হল, অ–ট্রাইবরা ট্রাইবাল এলাকায় জমি কিনতে পারবে। একসময় বোড়োরা সরল সাদাসিধে ছিল। কোনো বোড়ো গাঁওবুড়াকে গিয়ে অন্য গোষ্ঠীর মানুষ যদি বলত, আমি খেতে পাচ্ছি না, তাকে বলা হত, যা পাঁচ বিঘা জমি নিয়ে থাক। কেউ বলল, গরু নাই, তাকে একজোড়া হালবলদ দিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু পরে অর্থনৈতিক সঙ্কট বাড়ল। জমির চাহিদা বেড়ে গেল। আজ বলা হচ্ছে, তোমরা চলে যাও।

এবারকার সংঘর্ষে এককভাবে বোড়োদের দায়ী করা যায় না। মুসলমান সম্প্রদায়ও সমানভাবে দায়ী। ওরাও হত্যা কম করেনি। কে কতটা আগ্রাসি, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। বোড়োদের হাতে আর্মস আছে। মুসলমানদের হাতে আর্মস নাই, তাদের হাতে ছুরি, দা, কাটারি। তারা সশস্ত্র লড়াই করেনি। বোড়োরা করেছে। ফলে এরা বড়ো ধরনের তাণ্ডব চালিয়েছে। আবার ধুবড়ি জেলায় যেখানে বোড়োরা সংখ্যালঘু, সেখানে মুসলমানরা গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করেছে। অতএব দাঙ্গাহাঙ্গামা একতরফা হয়নি। শিবিরে অসহায় অবস্থায় রয়েছে চল্লিশ হাজার বোড়ো। আর অ–বোড়ো শিবিরে রয়েছে প্রায় দু–লক্ষ মানুষ। কেন এই দাঙ্গা হল? নানান ধরনের প্রশ্ন মানুষের মনে আসছে। নানান ধরনের স্বার্থ এখানে উসকানির কাজ করেছে। তবে যারা সংবাদ নিতে যায়, তারা কেউই সংঘাতের কেন্দ্রগুলোতে যায় না। যতখানি গা বাঁচিয়ে রিপোর্ট করে।

দাঙ্গা বন্ধে মিছিল

রাজ্যপালকে স্মারকলিপিতে দাবি জানানো হয়,

১) যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের আরও বেশি হস্তক্ষেপ এবং আরও বেশি সেনা মোতায়েন, ২) উৎখাত ও বিতাড়িত হওয়া মানুষদের সকলের পূর্ণ নিরাপত্তা ও পর্যাপ্ত ত্রাণ, ৩) সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী বোড়োদের চিহ্নিতকরণ ও দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া, ৪) সন্ত্রাসী বোড়োদের আক্রমণে নিহতদের পরিবারপিছু এককালীন দশ লক্ষ টাকা ও গুরুতর আহতদের দুই লক্ষ টাকা এবং অল্প আহতদের পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ, ৫) গৃহহারা পরিবারকে যথাস্থানে যত শীঘ্র সম্ভব পুনর্বাসন।

৩০ জুলাই মিল্লি ইত্তেহার জামাতি ইসলামি ও তার ছাত্র সংগঠন এসআইও আসামে অবিলম্বে জাতিদাঙ্গা বন্ধের দাবিতে প্রদেশ কংগ্রেস অফিস ও আসাম ভবনে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভকারীরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে একটি স্মারকলিপি দেয়। ওই স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়েছে, অবিলম্বে আসামে দাঙ্গা বন্ধ করতে হবে এবং দাঙ্গা বন্ধের জন্য প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। প্রদেশ সভাপতি বিক্ষোভকারীদের বলেন, আপনাদের দাবি যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া হবে। বিক্ষোভকারীদের মিছিল আসাম ভবন এবং রাজভবন যায় এবং স্মারকলিপি দেয়।

শরণার্থী শিবির থেকে

আমরা মনে করছি, ফিরে গেলে আবার আক্রমণ করা হবে। এবার গেলে হয়ত আমাদের প্রাণে মেরে ফেলা হবে। তাই আমরা ফিরতে চাইছি না।

এই রাজ্যের সরকার যদি আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে, তাহলে আপনারা কি থাকবেন এখানে? — প্রশ্নের উত্তরে তারা জানাল, সে ব্যাপারে তারা একা কিছু বলতে পারবে না। সবাই মিলে আলাপ আলোচনা করে তবে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব।

প্রতিনিধিদলের অভিজ্ঞতা, আসাম সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কেউই এই শরণার্থীদের যেভাবে যত্ন নেওয়ার কথা, সেভাবে যত্ন নিচ্ছে না। ছোট্ট একটা মসজিদে হাজারের ওপরে মানুষ গাদাগাদি করে বসবাস করছে। অবিলম্বে যদি তাদের যত্ন না নেওয়া হয়, তাহলে যে কোনো ছোঁয়াচে অসুখ বা ডাইরিয়া ছড়াতে পারে।

আপনাদেরকে মারছে কারা, আর মরছে কারা? — এ প্রশ্নের উত্তরে শরণার্থীরা জানাল, ওখানে যারা বোড়ো, তারা বাদ দিয়ে আর সবাইকে মারছে। বোড়োদের বক্তব্য, এখানে বোড়োল্যান্ডে যারা অ–বোড়ো, সে মুসলিম হোক, হিন্দু হোক, বা আর কিছু হোক — কাউকে ওরা থাকতে দিতে চাইছে না।

একজন বিএ পাশ যুবক শরণার্থী জানালেন, এর আগে ১৯৯৬ সালে সাঁওতালদের তাড়ানো হয়েছিল। সেই সময় সাঁওতালরা এইসব এলাকাতেই আশ্রয় নিয়েছিল। এই আশ্রয়শিবিরে যারা এসেছে, তারা যে গ্রাম থেকে এসেছে সেগুলি সম্পূর্ণ মুসলিম গ্রাম। তাই এই আশ্রয়শিবিরে কেবল মুসলিমরাই আছে। বোড়োদের আক্রমণের শিকার সবাই — মুসলিম, হিন্দু, সাঁওতাল সবাই। একটা একটা করে টার্গেট করছে। ছিয়ানব্বই সালে সাঁওতালদের মেরেছে। তারপর অমুসলিম বাঙালিদের তাড়িয়েছে। তারপর অসমিয় হিন্দুদের তাড়িয়েছে। এরপর টার্গেট মুসলমানরা।

স্বশাসিত বোড়োভূমিতে অ–বোড়োদের বঞ্চনার পথ ধরে জাতিদাঙ্গা

বিজয়া কর সোম, শিলচর, ৩১ জুলাই •

বোড়োভূমিতে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা আপাতত শিবিরে আশ্রিতদের পুনর্বাসন। ঘরবাড়ি জ্বলেছে, গ্রামের পর গ্রামের অস্তিত্বই নেই। সরকারি হিসেব বলছে, ২৭০টি শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে ৩.৯২ লক্ষ মানুষ। এত বিশাল সংখ্যাক মানুষের পুনর্বাসন কি সম্ভব? কোকরাঝাড়–বঙ্গাইগাঁওয়ের প্রায় দু–দশক আগের শরণার্থী সমস্যা আজও সমাধান করে উঠতে পারেনি সরকার। ১৮ বছর আগে জাতিদাঙ্গার শিকার ১৩৭৫টি পরিবার এখনও পুনর্বাসনের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৩, ১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালে অবিভক্ত কোকরাঝাড় জেলা ও বঙ্গাইগাঁওয়ে জাতিদাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় মোট ১১,৬৭৪টি পরিবার। প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে দাঙ্গাকবলিত জায়গাগুলি ঘুরে গেছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আর্থিক সহায়তার। কিন্তু দাঙ্গার মূল কারণ কী তা দেখবেন না প্রধানমন্ত্রী? এর আগেও দাঙ্গা হয়েছে। কেন্দ্রের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এরপরও ঘটে গেল এবারের দাঙ্গা। এখনও যদি দাঙ্গার সঠিক কারণ বের না করে শুধু আর্থিক সহায়তার কথা বলে কেন্দ্রীয় সরকার এই অধ্যায়কে বন্ধ করে দেন, তাহলে ভবিষ্যতে আরও দাঙ্গা ঘটবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

এই গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের পেছনে আদতে রয়েছে আর্থ–সামাজিক অনুন্নয়ন ও বঞ্চনার ক্ষোভ। বোড়ো টেরিটরি তথা নিম্ন আসামের জেলাগুলিতে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে পা দিলে দেখা যায় চারদিকে শুধু হাহাকার। পথঘাট–স্কুল–স্বাস্থ্যকেন্দ্র–বিদ্যুৎ–কলকারখানা–হিমঘর ইত্যাদি কিছুই নেই। অধিকাংশ মানুষ অপুষ্টির শিকার। গত ছয় দশকে তাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। অনেকেই পেটের তাগিদে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে গৌহাটির রাজপথে রিক্সা–ঠেলা চালায়, সব্জি ফেরি করে, ভাঙা লোহা–লক্কড় যোগাড় করার মতো কাজ করছে। অথচ এই নিম্ন আসাম থেকে প্রতিনিধিত্ব করে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেছিলেন প্রয়াত শরৎচন্দ্র সিংহ। মন্ত্রিসভায়ও প্রতিনিধিত্ব করেছেন অনেকে।

আশির দশকে অর্থাৎ আসু–র বিদেশি খেদা আন্দোলন চোখ খুলে দেয় বোড়োদের। তাই আসু–র আন্দোলনের পরে পরেই স্বগোষ্ঠীয় লোকেদের একত্রিত করে সাংবিধানিক অধিকার আন্দোলনে নেমে পড়ে বোড়ো সম্প্রদায়ের অগ্রণী গণ–সংগঠনগুলি। এটা কিন্তু অনগ্রসর এলাকার উন্নয়নের জন্য নয়। এটা ছিল বোড়োদের স্বাধিকারের আন্দোলন। ১৯৮৬ সাল থেকে নিখিল বোড়ো ছাত্র সংস্থা ও সহযোগী বোড়ো জঙ্গীদের হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৯৩ সালে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে গঠন করা হয় বোড়ো অটোনমাস কাউন্সিল। কিছুদিনের মধ্যেই প্রমাণিত হল এই স্বশাসন অকেজো। ফের শুরু হল জঙ্গি আন্দোলন। চলল ২০০৩ সাল পর্যন্ত। আবার ত্রিপাক্ষিক চুক্তি। সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলের আওতায় গঠিত অধিক ক্ষমতার স্বশাসন। কয়েক বছরের মধ্যেই আওয়াজ ওঠে, এটি অবহেলিত বোড়োদের সামনের সারিতে তুলে আনতে সক্ষম নয়। তাই পৃথক বোড়ো রাজ্য চাই।

মনে রাখতে হবে, এই এতটা বছরে (অর্থাৎ 'অধিক ক্ষমতার স্বশাসন' থাকা সত্ত্বেও) বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ লাভ করার পরও অনগ্রসর এলাকার কোনো উন্নতি হয়নি। মুসলিম, রাজবংশী, সাঁওতাল, বাঙালি সহ অন্যান্য অ–বোড়োদের অবস্থা যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে। কারণ, স্বশাসিত বোড়োভূমিতে বোড়োরা যতটা সুবিধা ভোগ করেছে, অ–বোড়োরা তার এক আনাও পায়নি। রাজনৈতিক ক্ষমতা একচেটিয়াভাবে ছিল বোড়োদের হাতে। একটা ছোটো উদাহরণ দিই। বাসুগাঁও পুরসভার চার ওয়ার্ডের বাসিন্দা–ভোটারের ৯৯ শতাংশই অ–বোড়ো সম্প্রদায়ের। একই অবস্থা কোকরাঝাড় পুরনিগমের। অথচ এই দুই পুর প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের পদ তফশিলি উপজাতিদের (বোড়োদের) জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে ইদানিং। এর ফলে সামান্য সুবিধে যেমন, বিপিএল কার্ড, বিধবা ভাতা ইত্যাদি সরকারি সুবিধা অ–বোড়োদের জন্য হলেও তারা ভোগ করতে পারে না। গ্রামে গ্রামে গড়ে তোলা হয়েছে ভিসিডিসি বা গ্রামীন উন্নয়ন পরিষদ। এখানেও স্বশাসনের ক্ষমতাসীনদের দাপট ও একচেটিয়া আধিপত্য। দু'বারের নির্বাচিত অ–বোড়ো প্রতিনিধিরা স্থান পায় না মন্ত্রীসভায়। অথচ বোড়োদের অহিংস আন্দোলনে সহায়তা করেছে প্রত্যেক অ–বোড়ো জনগোষ্ঠীর লোকেরা।

কয়েকবছর ধরে দেখা যাচ্ছে, জনসংখ্যার মাত্র এক শতাংশ বোড়ো বাসিন্দা রয়েছে, এরকম এলাকাকেও অত্যন্ত কৌশলে বোড়ো টেরিটরির (বিটিএডি) মধ্যে ঢোকানো হয়েছে। পাঠশালা, বরমা, বাসুগাঁও, ফকিরাগ্রাম, সাপটাগ্রাম, গোসাইগাঁও ইত্যাদিতে শূন্য থেকে পাঁচ–দশ শতাংশ বোড়ো রয়েছে। অথচ এগুলি বিটিএডির অন্তর্গত। এইসব আর্থ–সামাজিক বিভেদ বৈষম্যের কারণেই অ–বোড়োদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ক্ষোভ। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের একটি বড়ো অংশ আমসু (নিখিল আসাম সংখ্যালঘু ছাত্র ইউনিয়ন) এবং বোড়োল্যান্ড আমসু–র ব্যানারে সম্প্রতি মুখর হয়ে ওঠে। এটাই সহ্য হয়নি ক্ষমতার বলে বলীয়ানদের। গোসাইগাঁও–এ দুই নিরপরাধ মুসলিম যুবককে হত্যা, শেরফাংগুড়িতে মুসলিম দিনমজুর হত্যার পর গত ১৮ জুলাই কোকরাঝাড়ে দুই প্রাক্তন আমসু নেতার ওপর হামলা এবং এর জেরে ১৯ জুলাই রাতে মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে চার বন্দুকবাজ প্রাক্তন বোড়ো লিবারেশন টাইগার সদস্যের হত্যাকাণ্ড স্ফুলিঙ্গের কাজ করে দিল।

অবাধে জলাভূমি ভরাট চলছে শান্তিপুর পুরসভার উদ্যোগেই

শমিত, শান্তিপুর, ২৭ জুলাই •

শান্তিপুর পৌর অঞ্চলে অন্তত দশটি পুকুর ও জলাভূমি ধ্বংসের সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে রয়েছে শান্তিপুর পুরসভা। জলাভূমি রক্ষা ১৯৮৪ অ্যাক্ট এবং সংশোধিত ইনল্যান্ড ফিশারি ১৯৯৩, ১৭–এ ধারার কোনো প্রকার গুরুত্ব না দিয়েই পৌর অঞ্চলের মধ্যেই পুকুর ও জলাভূমি বুজিয়ে চলেছে পুরসভা। জলাভূমিগুলি বোজানো হচ্ছে শান্তিপুর পুরসভার আবর্জনা বহনকারী গাড়ির সাহায্যেই। পুরসভার আবর্জনা বহনকারী গাড়ি দিয়েই মাটি ও আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। প্রোমোটারি কোনো দুষ্টচক্র এর পিছনে মদত দিচ্ছে।

যে যে পুকুরগুলি ভরাটের অভিযোগ এসেছে তাদের একটি হল পুরসভার ভবনের কয়েক গজের মধ্যেই। তার নাম 'পোদ্দার পুকুর'। অন্যান্য জলাভূমিগুলি হল দত্তপাড়ার 'রায় পুকুর', সর্বানদী পাড়ার 'সাহা পুকুর', কবি করুণানিধান স্ট্রীটে 'চ্যাটার্জী পুকুর', 'বোকা পুকুর', অদ্বৈত সড়কে 'চৌধুরী পুকুর', 'কালাচাঁদ পুকুর', ৬নং ওয়ার্ডে 'সেন পুকুর', বড়ো গোস্বামী পাড়ার গোস্বামীদের একটি পুকুর। এছাড়াও শান্তিপুর খালপাড় অঞ্চলের অনেকগুলি জলাশয়ের প্রায় ৫০% ওপর মাটি ও জঞ্জাল ফেলে বুজিয়ে দেওয়ার ধীর চেষ্টা চলছে। এগুলির কোনো জায়গাতেই শান্তিপুর পুরসভার পক্ষ থেকে কোনো আইননানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উপরন্তু পুরসভা প্রোমোটারদের স্বার্থেই কাজ করে চলেছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ।

শান্তিপুর বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সমিতি শান্তিপুরের জলাভূমি ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে শান্তিপুর থানায় এফআইআর দায়ের করে (কেস নং ৩৯৩/২); ৩৪৩, ৩২৩ ও ২০৬ ধারা মোতাবেক ১৯.০৬.২০১২ তারিখে এই অভিযোগ জানানো হলেও এখন পর্যন্ত কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পুকুর ও জলাভূমি বোজানোর পাশাপাশি শান্তিপুর পৌরসভার মধ্যে বিভিন্ন স্থানে অবাধে গাছ কাটাও চলছে। বহুবার পুরসভাকে জানিয়েও পুরসভার তরফে নিষ্ক্রিয়তাই চোখে পড়ছে। WBLP অ্যাক্ট সেকশন ৪ডি অনুযায়ী এদের জেল ও জরিমানা হওয়ার কথা। কিন্তু পুরসভার তরফে প্রোমোটারি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না। অথচ প্রতি বছর শান্তিপুর পুরসভার পক্ষ থেকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পদযাত্রার আয়োজন করে জলাভূমি ও জলাশয় রক্ষার কথা ফলাও করে প্রচার করা হয়। পরিবেশ দিবসে পুরসভার তরফে তোলা ওই শ্লোগানগুলি যে কতটা ভাঁওতা তা শান্তিপুর পুরসভার কাজকর্ম দেখে সহজেই অনুমেয়।

কাঠের আসবাবপত্রের ছোটো কারবারির বিচিত্র অভিজ্ঞতা

অলকেশ মণ্ডল, বাগনান, ২৭ জুলাই •

আমি কাঠের কাজ করি। ঠিকাদারি আর কি। এই ঠিকাদারির সুবাদেই দীঘার কাছে একটা জায়গায় যাওয়ার কথা হয়েছিল। কথা হওয়ার দশদিন পরে আজকে গিয়েছিলাম। যিনি ফোন করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, আপনি যেদিন আসবেন, সেদিন গন্তব্য বলে দেব। দীঘা যাওয়ার বাস রুটে বাজাবেরিয়ায় নামতে হল। সেখানে আমাদের জন্য একটা মোটরসাইকেল অপেক্ষা করছিল আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। তিন চার কিমি ভেতরে গ্রামের মধ্যে। মাঠের মধ্যে একটা দোতলা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে কাজের কথা যখন পারছি, তাতে তেমন আগ্রহ দেখছি না। আমি কাজ করব, ক্যাটালগ দেখাচ্ছি, কিন্তু তেমন কোনো আগ্রহ দেখছি না। আমাকে আগেভাগে তো বলাও হয়নি। এই পরিস্থিতিতে আমি বললাম, আমি তো না খেয়ে এসেছি। আমি খেয়ে আসি, তারপর কাজের বরাত নিয়ে যাব। তখন আরেকজন আমার মতো লোককে ডেকে আনার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল মোটর সাইকেল আরোহীকে। আমাকে চা খেতে দেওয়া হল।

আরেকজন ব্যক্তি, যাকে আমার মতোই নিয়ে আসা হল, তিনি একটু বয়স্ক, ধুতি পাঞ্জাবী পরা। আমার মতোই তাকেও কিছুক্ষণ পরে চা দেওয়া হল। তারপর বাড়ির মালিকই হবেন সম্ভবত, তিনি বেরিয়ে এসে ওই বয়স্ক লোকের থেকে দু–লাখ টাকা নিলেন। পাঁচশো টাকার চারটে বান্ডিল। তারপর একটা টেবিলের পাশ থেকে একটা বাক্স খুলে সেখান থেকে একটা প্যাকেট বের করলেন। তার থেকে দুই বাই এক ফুট প্লাস্টিকের মোড়কের মধ্যে সিল করা কয়েকটি দশ টাকা এবং একশো টাকার বান্ডিল বের করলেন। এবং আমাদের কাছে কোনো গোপন না করে ওই ধুতি পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোককে দেওয়া হল। দু–লাখ টাকা দিয়ে পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। আমরা দেখলাম। ভদ্রলোক চলে গেলেন। তখন আমাকে একটি একশো টাকার নোট এবং একটি দশ টাকার নোট দিয়ে বাড়ির লোকটি বললেন, দেখুন তো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আমাকে জাল নোট দিয়ে পরীক্ষা করছেন? ভদ্রলোক মৃদু হাসছেন। ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। বললেন, আপনি কেন, কেউ বুঝতে পারবে না। এটা আমরা বানিয়েছি। পনেরো বছর ধরে এই কারবার করছি। মোটামুটি হাফ পয়সায় পাওয়া যায়। পঞ্চাশ টাকা দিলে একশো টাকা পাওয়া যায়। আর এই কাগজগুলো একদম অরিজিনালের মতো। আমরা যে নম্বর ব্যবহার করি, সেটা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে পেয়ে যাই। সুতরাং আমাদের নোটকে জাল বলার ক্ষমতা কারো নেই। আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম, কারণ এ ধরনের জিনিস দেখব বলে ভাবিনি। ভদ্রলোক আমাদের অফার করলেন, আপনি তো সাইড বিজনেস হিসেবে এটা করতে পারেন।

আমরা খুব অবাক হলাম। একটা গ্রামের মধ্যে, চারিদিকে মাঠের মধ্যে একটা ঝাঁ চকচকে বাড়ি, দেখেই মনে হবে এটা পয়সাওয়ালা লোকের বাড়ি, সেখানে বসে ইনি এই কারবার পনেরো বছর ধরে করছেন। আশ্চর্য লাগল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে কাটা ফাটা নোটের নম্বর পেয়ে যান ইনি, ফলে এই ধরনের নোটকে জাল বলা যাবে না। ভদ্রলোক আরও গুণগান করছিলেন তাঁর এই নোটের। বলছিলেন, পাকিস্তান থেকে যে জাল নোট আসে, সেগুলি নখ দিয়ে খুঁটলেই আরবিআই–এর সিল উঠে যায়, কিন্তু এই নোটে ওঠে না, ডাবল পেপার থাকে — এইসব। এই ধরনের ব্যবসা আমাদের অফার করায় আরও আশ্চর্য লাগল। মূল কাজের কথা আর হল না তেমন করে। আগামী দিনে কী করব না করব, ক্যাটালগ নিয়ে আবার যাব কি না, ফার্নিচারের কাজ কী হবে না হবে, সে প্রসঙ্গ যেন আউট হয়ে গেল কথা থেকে। আমাদের অনাগ্রহ দেখে তাড়াতাড়ি ইনি মোটর সাইকেল আরোহীকে ফোন করে দিলেন যে এনারা যাচ্ছেন, এঁদের পৌঁছে দিয়ে আয়।

এটা খবই সন্দেহজনক বিষয়। আমি কাঠের কাজ করি, আমাদের বাগনান এলাকার কিছু ছেলে কাজ করে, তাদের থেকে হয়ত নম্বর পেয়ে আমাকে ফোন করেছিল। ফোনে বলেছিল, অনেক টাকার কাঠের কাজের কন্ট্রাক্ট। কিন্তু আমাকে এসব কিছুই জিজ্ঞাসা করা হল না। কাজের থেকেও এই জাল নোটের কারবারে আমার অংশ নেওয়ার প্রবণতা নেই, এটা তাদের খুব আক্ষেপের বিষয় হল।

আমার সঙ্গে যে ছেলেটি গিয়েছিল, সে সেদিনের কাগজের শব্দসন্ধান ছক পূরণ করবে বলে একটা পেন কিনতে একটা দোকানে গিয়েছিল বাজাবেরিয়ায়। সেই দোকানে কেউ নাকি তাকে বলেছিল, আপনারা দেখবেন, এক্ষুনি একটা মোটর সাইকেল আসবে, আপনাদের নিয়ে যাবে। ওই জায়গাটা ভালো নয়, এরকমও সব মন্তব্য করেছিল। আর বলেছিল, আপনারা যাঁর কাছে যাচ্ছেন, তাঁর সাথে সাবধানে কথাবার্তা বলবেন। আমার সঙ্গী প্রিয়রঞ্জন আমাকে পরে জানাল। সে একটু সাবধান হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের মধ্যে এরকম একটি জাল ব্যবসা যথেষ্ট উদ্বেগের।

সংযোজন : একদিন বাদে আমি বাগনানের কিছু ছোটো কারবারীদের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, ওটা জাল নোটের কারবার নয়, জাল নোটের কারবারের লোভ দেখিয়ে মানুষের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার কারবার। এতে অনেকেই ঠকেছে, কিন্তু ঠকে যাওয়ার পর বাইরে প্রকাশ করে না। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ওই গ্রামটির নাম সুলতানপুর, বাজাবেরিয়ার পশ্চিম দিকে।

প্র থ ম পা তা র প র

এই সপ্তাহে বৃষ্টি না হলে আমন ধান শেষ

একটা জমিতে বীজ বুনতে গেলে ৬ জন লোকের পিছনে ১২০০ টাকা লাগে। এক বিঘা জমিতে ট্রাক্টরে হাল দিতে ৩৫০ টাকা পড়ে। সেই হিসাবে একটা খরচ হয়ে গেছে। পাঁচ বিঘা জমিতে ৪২০০ টাকা মতো খরচ। এরপর যদি প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়, গাছের গোড়ায় ঘাস জন্মাবে। ওগুলো পরিষ্কারের জন্য লোক লাগবে। সেই হিসেবে এবছর অবস্থা খারাপ। বৃষ্টি হলে গাছের গোড়াটা মোটা হবে, একটা থেকে দশটা হবে।

গত বছর বিঘেতে ৬ বস্তা (৬০ কেজির বস্তা) মতো ধান হয়েছিল। এবছর বোরোটাও ভালো হয়েছিল। বিঘেতে ৯ বস্তা ধান হয়েছিল। ওর খরচও একটু বেশি, ফসলটাও ভালো পাওয়া যায়। আমাদের নিজেদের ঘরের প্রয়োজনের ধানটা রাখতে হয়, একস্ট্রা যেটা হয় বিক্রি করি। কারণ চাষের খরচটা তুলতে হয়। ফলনের ওপর নির্ভর করে। আমাদের জমিটা নিচু, এঁটেল মাটি। সবজির চেয়ে ধানটাই ভালো হয়।

যে সুখ–দুঃখের কথা আপনি পাঁচজনকে শোনাতে চান, সেটা ঝটপট ফোন করে জানান আমাদের। ফোন নং ২৪১৪৭৭৩০, ৮০১৩৪৭৩৭৪৭। খবর দিন।

পত্রিকার পাতা থেকে

মারুতি সুজুকি মানেসর ডায়েরি (১)

শের সিং সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'ফরিদাবাদ মজদুর সমাচার' থেকে •

সঞ্জয় গান্ধীর ছোটো গাড়ির প্রকল্প না চলায় মারুতি কোম্পানির সরকারিকরণ করা হয়। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এই কোম্পানির গুরগাঁও কারখানা থেকে প্রথম গাড়ি তৈরি হয়। সেই সময় ভারত সরকারের শেয়ার ছিল ৭৬% এবং জাপানের সুজুকি কোম্পানির ২৪%। ক্রমশ সুজুকির শেয়ার বাড়তে থাকে। ১৯৮৭ সালে তাদের ৪০%, ১৯৯২–তে আধাআধি এবং ১৯৯৮–তে ৫৪% হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারুতি কোম্পানির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সুজুকির হাতে চলে যায়।

১৯৮৩ সালে দক্ষ স্থায়ী শ্রমিকদের নিয়ে উৎপাদন শুরু হয়েছিল। ১৯৯২ সালে এখানে ৪৫০০ স্থায়ী শ্রমিক এবং ২২০০ অন্যান্য কর্মচারী কাজ করত। ১৯৯৭ সাল থেকে ঠিকেদারদের মাধ্যমে ঠিকা শ্রমিক নেওয়া শুরু হয়। ২০০০ সালে যখন প্রথম ধর্মঘট হল, ঠিকা শ্রমিকদের দিয়ে কাজ চালু রাখা হল। ইউনিয়নকে হাত করে ধর্মঘট করানো হয়েছিল, যাতে শ্রমিকদের দুর্বল করে ফেলা যায়। ২০০১ সালে ১২৫০ জন স্থায়ী শ্রমিককে ছাঁটাই করা হল। ২০০৩ সালে আবার ১২৫০ জন ছাঁটাই হল। ২০০৭ সালে এসে মারুতি সুজুকির এই গুরগাঁও ফ্যাকট্রিতে ১৮০০ স্থায়ী এবং ৪০০০ ঠিকা শ্রমিক কাজ করত। তখন স্থায়ী শ্রমিকদের মাইনে ছিল ২৫০০০ টাকা, ঠিকা শ্রমিকরা পেত ৩৫০০–৫০০০ টাকা। এছাড়া ফরিদাবাদ, গুরগাঁও, ওখলা এবং নয়ডা শিল্পাঞ্চলে হাজারো জায়গায় মারুতি গাড়ির বেশিরভাগ কাজ করিয়ে নেওয়া হত। ৮০০ থেকে ১২০০ টাকা মাইনে দিয়ে মারুতি গাড়ি তৈরির বিভিন্ন কাজ করানো হয়ে এসেছে।

২০১১ সালে ৩০০ একর জায়গার ওপর পুরোনো গুরগাঁও ফ্যাকট্রির তিনটে প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল বছরে ৭ লক্ষ গাড়ি। ৬০০ একর জমির ওপর মানেসরের দ্বিতীয় ফ্যাকট্রিতে ২০০৭ সালে উৎপাদন শুরু হয়। এখানকার অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ৩ লক্ষ গাড়ি। ২০১২ সালের মার্চ মাস থেকে পঞ্চম অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্টে আরও আড়াই লক্ষ গাড়ি তৈরি শুরু হয়। ২০১১ সালে এখানে স্থায়ী শ্রমিকেরা সব মিলিয়ে হাতে পেত মাসে ১৭০০০ থেকে ১৮০০০ টাকা। কিন্তু বিয়ে বা পারিবারিক কোনো সমস্যার জন্য চারদিন কাজে অনুপস্থিত থাকলে ৮৯০০ টাকা কেটে নেওয়া হত। একদিন না এলে ২২৫০ টাকা কেটে নেওয়া হত। ঠিকা শ্রমিকদের মধ্যে যারা আইটিআই পাশ, তারা মাইনে পায় কেটেকুটে ৭২০০ টাকা আর অন্যরা ৬২০০ টাকা। কিন্তু একদিন কাজ কামাই করলে ২০০০ টাকা কেটে নেওয়া হত। কোনো প্রতিবাদ করলেই ঠিকেদার কাজ থেকে বসিয়ে দিত। কথায় কথায় সুপারভাইজর আর ম্যানেজারেরা স্থায়ী শ্রমিকদের গালিগালাজ করত, কলার চেপে ধরত। বেয়াদব শ্রমিককে এক লাইন থেকে অন্য লাইনে সরিয়ে দেওয়া হত। একজন শ্রমিক বলেন, 'চায়ের জন্য সাত মিনিট বরাদ্দ সময়ে ৪০ গজ হেঁটে গিয়ে এক হাতে কাপ আর মুখে ব্রেড পকোড়া গুঁজে নিতে হত। প্যান্টের চেন খুলে পেচ্ছাপ করার জন্য দু–মিনিট হেঁটে গিয়ে লাইন লাগাও ... কাজের এমন চাপ যে চুলকুনি থাকলেও চুলকানোর সময় নেই ... কোম্পানি এক কোটি গাড়ি বানানোর পর মোবাইল ফোন উপহার দিয়েছে, কিন্তু কথা বলার ফুরসত তো দেয়নি ... ১৭০০০ টাকা মাইনে বলে হাতে ১২০০০ দেয়। হাতে পেয়ে বউ সন্দেহ করে ...'

এমন অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য স্থায়ী শ্রমিকেরা দু–হাজার করে টাকা চাঁদা দিয়ে নতুন ইউনিয়ন বানানোর তোড়জোড় শুরু করল।

চলবে

প্র থ ম পা তা র প র

মারুতি শ্রমিকের হিংসা

দুপুর তিনটেয় বি–শিফ্টের শ্রমিকেরা যখন কারখানার গেটে পৌঁছাল, ইউনিয়নের নেতারা এ–শিফ্টের শ্রমিকদের কারখানার ভিতর থাকতে বলল। দুপুর সাড়ে তিনটেয় নেতারা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে জিয়া লালের সাসপেনশন প্রত্যাহার নিয়ে কথা বলতে যায়। শপ ফ্লোরে গাড়ি তৈরির কাজ চলতে থাকে। বিকেল পাঁচটায় শ্রমিকেরা জানতে পারে, জিয়া লালকে কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না এবং এ ব্যাপারে ম্যানেজমেন্ট আর কথাও বলবে না। মানেসর প্ল্যান্টের কর্তারা জানিয়ে দেয়, বিষয়টা তাঁদের হাতে নেই, ওপরতলার কর্তারাই যা কিছু করবে।

দুপুরে যখন নেতারা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলতে যায়, তখন থেকেই শ–খানেক পুলিশ জড়ো হয় মেন গেটের সামনে। কিন্তু শ্রমিকদের বিক্ষোভ বাড়তে থাকে এবং সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ তা হিংসাত্মক রূপ নেয়। শ্রমিকদের হাতে চল্লিশ জন ম্যানেজার গুরুতরভাবে আহত হয়। লোহার রড এবং গাড়ির ডোর বিম নিয়ে শ্রমিকেরা ম্যানেজারদের আক্রমণ করে। হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজারের পা ভেঙে দেওয়া হয় এবং তিনি পুড়ে মারা যান। এরপরই শ্রমিকেরা পালাতে শুরু করে। পুলিশ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো থেকে ৯০ জনকে গ্রেপ্তার করে।

ফলতায় বর্ষার ধান চাষের হাল

(বাঁয়ে) 'কাগরি তলা' (শক্ত জমিতে বীজ দেওয়া, বৃষ্টি হলে তা থেকে চারা বেরোয়) করেছেন রবীন জানা আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহে। এই জমি রাস্তার পাশের খালের ধারে। এখানে জলের চাপ ভালো থাকে, আর যে বাঁশ দেখা যাচ্ছে, তার কাছ দিয়ে সেচের জন্য সোঁতা খাল আছে। (মাঝে) ১৪ শ্রাবণ রবীন জানার জমিতে ট্রাক্টরে হাল হচ্ছে। (ডানে) জমি রোয়ার কাজ করছেন হরিসাধন, এটা লাল স্বর্ণ ধান। পাশের জমিতেও কিছু লাল স্বর্ণ ধান পেয়ে চাষ করেছেন গৌতম। মাছের ব্যবসায় লস খাওয়ায় এইবার চাষে নেমেছেন, জমি আগাম নিয়ে।

(বাঁয়ে) লাল স্বর্ণ ধানের 'পেকে তলা' (পাঁকে বীজতলা) করা হচ্ছে ২৫ আষাঢ়। এই ধান বিজিআরইআই প্রকল্পে কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে পাওয়া। ফলতা মল্লিকপুরে। (মাঝে) ভাতারে হরিশপুরের আগে ঝুমিয়া গ্রামের কাছে পুবের মাঠ, ১৩ শ্রাবণ। (ডানে) তনুদা খোরোর সময় চাষ করেছেন, আর মাসুম ইট ভাটায় কাজ করেছেন, এখন সকালে মাঠে কাজ করছেন আর ফাঁকে মহিরামপুরের ফকিরপাড়া থেকে ওস্তাগরের কাজ নিয়ে এসে কাটিং করছেন, পার পিস ১ টাকা। এই 'তিন জোড়' কমদামি হাফপ্যান্ট হাওড়ার হাটে বিকোয়।

পার্থ কয়াল, ফলতা, ৩১ জুলাই •

আজ শ্রাবণ মাসের ১৫ তারিখ, গোটা ফলতা ব্লকের বেশিরভাগ জমিতেই রোয়া বাকি। মাঠে জল জমেনি। মাঝে একটা কোটালে (আষাঢ় মাসের শেষ কোটালে) জল উঠলেও সব জমি সে জল পায়নি। তার ফলে যারা চাষের ওপর একান্ত নির্ভরশীল তারা অনেকে বুঝে উঠতে পারেনি কী করবে। এবারে গরম পড়েছিল প্রচণ্ড। বৈশাখ মাসের দিকে যখন খোরোর ধান ওঠার সময়, তখন অল্পসল্প বা কখনো বৃষ্টির সাথে ঝড়। তাতে সাত তাড়াতাড়ি করে ধান তুলেছে লোকে। তারও আগে ফাল্গুনের শেষে আর চৈত্র মাসের দিকে শিলাবৃষ্টি হতে সবে থোড় আসা ধানের ক্ষতি হয়েছিল খুব। সার, বিষ, হাল সব দেনাদুনি করে, জমিও আগাম টাকায়, গতর খাটিয়ে আড়াই বিঘে জমি চাষ করে চার বস্তা ধান পেয়েছেন। তাও অনেক ধান চিটে হয়েছে, খোরাকিটাও হবে না, দেনা শোধ করা তো দূরের কথা।

চালু একটা শ্লোক আছে হিন্দু চাষিদের মধ্যে — কী জানি কী পাঁজি পুঁথি, আষাঢ় মাসের সাড়ে সাত দিনে অম্বুবাচি। আর এই অম্বুবাচির আশপাশের মধ্যেই বীজতলা তৈরি শেষ করে ফেলার কথা। ওই সময় থেকে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে তাপমান কমতে শুরু করে। এবারও সবেবরাতের পর ২১ আষাঢ় প্রথম ফলতা ব্লকে ভারী বৃষ্টি হল। তারপর মাঠে হালকা রস ছিল, কিন্তু তা হাল করার মতো নয়। এই শ্রাবণ মাসের ৪/৫ তারিখ থেকে বৃষ্টি নামল, ভালো করে তাতে জল জমল। তাও সমস্ত মাঠে নয়, ফলতা দোস্তিপুর রোডের ওপর ৪ নং–এ নেমে নিত্যানন্দপুর বা দিঘিরপার নস্করপুর রোডে। ভাতারের পোলের কাছে সহলা–কাঁটাফুলি/হরিশপুর এই সমস্ত মাঠ খালা প্রকৃতির, আর তাই জলের চাপটাও সমস্ত সময় বেশি থাকে।

BOOK POST/REGISTERED JOURNAL
সংবাদমন্থন ৪ KHOBORER KAGOJ SAMBADMANTHAN (fortnightly) Vol 4 Issue 3 1 August 2012 Rs 2
Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

ধ্বংসের পথে বালী দেওয়ানগঞ্জের পঞ্চমন্দির

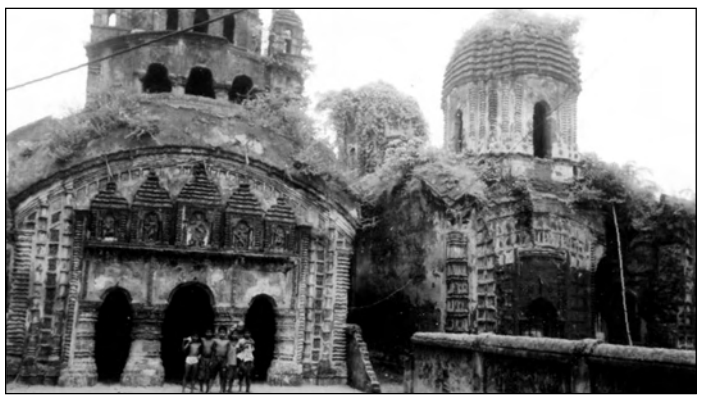

দীপংকর সরকার, হালতু, ৩০ জুলাই •

আপন খেয়ালেই গত ১৫ জুলাই বেড়িয়ে পড়েছিলাম বালী দেওয়ানগঞ্জের উদ্দেশ্যে। জায়গাটি হুগলি জেলার আরামবাগ থেকে গোঘাট থানার অন্তর্গত বালী গ্রাম পঞ্চায়েত ১৭ কিমি দুরত্ব। কলকাতা থেকে ১১০ কিমি হাওড়া থেকে ৬–৩২ মিঃ ট্রেনে তারকেশ্বর ৮–০৫ মিঃ পৌছে বাস স্ট্যান্ডে পৌছান যায় । যেখান থেকে সরাসরি বালী দেওয়ানগঞ্জ বাস ৯–৩০ মিঃ যায়। অন্যথায় ৮–৩০ মিঃ আরামবাগের বাস ছাড়ে। আরামবাগ বাসস্ট্যান্ড থেকে বালী দেওয়ানগঞ্জ যাওয়ার বাস পাওয়া যায় সকাল ৯–৫০ নাগাদ। আরামবাগ থেকে দামোদরপুর যাওয়ার বাসেও যাওয়া যায়। আরামবাগ থেকে বালী দেওয়ানগঞ্জ যেতে লাগে ৩৫ মিঃ।

আরামবাগ থেকে কিছুদূর এগিয়ে বাঁদিকে গ্রামের সরু উঁচু নিচু অসমান রাস্তা গেছে। একফালি সরু রাস্তা, দুদিকে চাষের জমি। দুধারে আলু ও পাট খেত। রাস্তার ধারে ছাড়ানো পাট জমিয়ে স্তূপ করা আছে। বাস থেকে নামতে হবে হালদারপাড়া বাসস্টপ। নেমে বাদিকে ঢুকতে হবে রাউতপাড়ার লালমাটির পথ ধরে। এখান থেকে হেঁটে যেতে হবে দশ মিনিট। বড়ো রাস্তা থেকে ভিতরে যত ঢুকবেন ততই অবাক হওয়ার পালা। গ্রামীণ লালমাটির মেঠো রাস্তা এঁকে বেঁকে গেছে। রাস্তার ধারে বালী গ্রাম পঞ্চায়েত ফলক লাগানো আছে। রাস্তার ধারে বিভিন্ন গাছের সারি। কোথাও শুকিয়ে যাওয়া গাছের ডালপালা জড়ো করা আছে। দুই তিনজনকে জিজ্ঞাসা করলাম পঞ্চমন্দির কোথায়। লোক দেখিয়ে দিল। কিছুদূর পর গন্তব্যস্থলে পৌছে দেখি পাঁচ যায়গায় অবস্থিত পঞ্চমন্দির। প্রথমে রাস্তার বাঁদিকে মঙ্গলচণ্ডী মন্দির। সামনে টিনে একচালা শেড দেওয়া। ৫০০ বৎসরের পৌরাণিক লাল ইটের মন্দির। এক মহিলা ভিতরে ঢুকে পুজো দিচ্ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম প্রতিদিন পুজো হয়? তিনি বললেন প্রতিদিন হয়। পাশেই একটি ফলক থেকে জানতে পারলাম ১৪২৪ সালে এটি তৈরি করান সুরেন্দ্র রাউত মহাশয়। মন্দিরের অবস্থা ধ্বংসের দিকে। একটু এগিয়ে সামনের দিকে একটি খোলা যায়গায় পাশাপাশি দুটি মন্দির। একটি দুর্গা ও অন্যটি নারায়ণ। এই দুটির অবস্থাও শোচনীয় অর্থাৎ অবলুপ্তির পথে। কিছু বাচ্চা ছেলে মন্দিরের সামনে বারান্দায় বসে ক্যারাম খেলছিল।

মঙ্গলচণ্ডী মন্দিরে ১৩টি চূড়া ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। একটু উঁচু যায়গায় অন্য দুটি মন্দির লাল ইটের তৈরি, প্রায় অবলুপ্তির পথে। কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছে। জোড়া মন্দিরের (দুর্গা ও নারায়ণ) সামনে একটি শিবমন্দির অনেক পরে তৈরি হয়েছে। এটির কোন স্থাপত্যশৈলী নেই।

এই অজানা অচেনা বাংলার মন্দির শৈলী স্থাপত্য অনাদরে আজ ধ্বংসের পথে। কিছু কিছু মন্দির আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া দ্বারা সংরক্ষিত। যেগুলি ধ্বংসের পথে সেগুলিকে সকলের নজরে আনতে হবে।

ফেরার পথে কিছুদূর একটি শিবকুটির দেখতে পেয়ে দাঁড়ালাম কিছুক্ষণের জন্য। দেখে মনে হল সেটিও বেশ পুরোনো দিনের। ছবি তুলে ফিরে আসছি, এমন সময় পিছন থেকে সাইকেলে চেপে একজন ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে (রামকৃষ্ণ গোল) বললেন, এই পঞ্চমন্দির ৫০০ বছরের পুরোনো। জানতে চাইলেন, আমি কোথা থেকে এসেছি। আমি বললাম, কলকাতা থেকে। আর বললাম, আপনাদের এই মন্দিরের ছবি নিয়ে গেলাম। আমাদের ওখানের একটি পাক্ষিক পত্রিকায় এ বিষয় লিখব।

বাসস্ট্যান্ডে এসে কিছুক্ষণ একটি চায়ের দোকানে বসলাম। দোকানি বললেন এখানে আরও অনেকে গাড়ি নিয়ে আসে এই পঞ্চমন্দির দেখতে। কিছুক্ষণ পর আরামবাগ যাওয়ার বাসে উঠলাম। সেখান থেকে তারকেশ্বর। এরপর ২–১৭ মিঃ হাওড়া লোকালে বাড়ি ফিরলাম। বাংলার হারিয়ে যাওয়া মন্দির স্থাপত্যের দর্শনে বিমোহিত হলাম আর মনে মনে ভাবলাম কীভাবে রক্ষিত হবে আমাদের ইতিহাসের সংস্কৃতি?

বিশিষ্ট লালন গবেষিকা তৃপ্তি ব্রহ্ম নিঃশব্দে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন

সঞ্জয় ঘোষ, জয়নগর, ৩০ জুলাই •

লালন গবেষিকা তৃপ্তি ব্রহ্ম নিঃশব্দে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। গত ২৫ জুলাই কলকাতার বেলেঘাটার কবি সুকান্ত সরণির অস্থায়ী আবাসে কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর তিনি মারা যান। পিতা শৈলেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম এবং মা কমলা ব্রহ্ম–র পাঁচ মেয়ে তিন ছেলের মধ্যে বড়ো মেয়ে তৃপ্তির জন্ম ১৯৩৭ সালের ৬ জুলাই, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ বারাসাতের একটি গ্রামে। সেসময় দক্ষিণ বারাসাত অঞ্চলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল থাকায় তিনি ১২ বছর বয়স থেকে জয়নগর বালিকা বিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি স্কুল ফাইনাল পাশ করেন। পরে বালিগঞ্জে মুরলিধর গার্লস কলেজ থেকে স্নাতক হন। জীবনের বহু চড়াই উৎড়াই পেড়িয়ে পড়ে চাকুরিরত অবস্থায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেটে বিএ এমএ পাশ করেন এবং বিনা গাইডে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলার লৌকিক ধর্ম সংগীত নিয়ে পিএইচডি লাভ করেন। চাকুরি জীবনে ২৯ বছর তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগে কাজ করেন। এর আগে তিনি বাঁকুড়ায় ৬ বছর স্কুলে পড়িয়েছেন। পরবর্তীকালে তিনি দক্ষিণ বারাসাত কলেজে প্রায় ৬ বছর অতিথি অধ্যাপক হিসাবে শিক্ষাদান করেন। মূলত লালন ও লোকসংস্কৃতির ওপরে গবেষণা করলেও আবৃত্তি, কবিতা, প্রবন্ধ রচনা, ছোটো গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া এসব বিষয়ে তাঁর অনায়াস দক্ষতা ছিল। সব মিলিয়ে তাঁর লিখিত এবং সম্পাদিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় ৫৪টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'লোকজীবনে বাংলার লৌকিক ধর্ম সংগীত ও ধর্মীয় মেলা'। এই বইটিতে তিনি পিএইচডি লাভ করেন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য 'বাংলার ইসলামি সংস্কৃতি', 'অমর একুশে', 'বাংলাদেশের সংস্কৃতি ঐতিহ্য এবং মহম্মদ মসুরুদ্দিন'। ছয় খণ্ডে লালন পরিক্রমা' তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। এছাড়া 'লালন নাটক', 'মরমী ব্যক্তিত্ব লালন ফকির', তাঁর সম্পাদিত প্রবন্ধ সংকলন উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা ইংরেজি গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Lalan, his Melodies, The Faith of Love, তাঁর লিখিত আরেকটি গ্রন্থ হল, 'ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতিতে নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব'।

বাংলাদেশের বহু সম্মান তিনি পেয়েছেন এবং প্রায় ৪০–৪৫ বার তিনি বাংলাদেশে গেছেন লালন ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত গবেষণার প্রয়োজনে এবং বিভিন্ন সংস্থার থেকে পেয়েছেন বহু সম্মান। কুষ্ঠিয়ার শেহরিয়ার যে লালন অ্যাকাডেমি ছিল, তিনি তার আজীবন সদস্যা ছিলেন। তবে নিজ ভূমি পশ্চিমবঙ্গে তাঁর কাজ বিশেষ কোনো সমাদর পায়নি বলে তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল।

জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রাঁচির নাগরি গ্রাম

সীতারাম, রাঁচি, ২৭ জুলাই •

ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচি শহরের লাগোয়া গ্রাম নাগরি এখন সেই রাজ্যের খবরের শিরোনামে। সরকার সেখানে ২২৭ একর জমিতে আইআইটি, আইআইএম প্রভৃতি করবে বলে পাঁচিল তুলছে। সরকারের যুক্তি, এই জমি ১৯৫৭ সালে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল রাজেন্দ্র কৃষি বিদ্যালয়, পরে বিরসা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার জন্য। কিন্তু জমির রায়তদের বক্তব্য, জমি অধিগ্রহণ তখন সম্পূর্ণ করা হয়নি। ২৫ জন ক্ষতিপূরণ নিয়েছিল, আর বাকি ১২৮ জন বিরোধিতা করেছিল। পরে আরও ১৪ জন ক্ষতিপূরণ নিয়েছে।

এই ঘটনার সাথে সাথেই রাঁচি শহর জুড়ে শোরগোল উঠেছে, সরকার রাঁচি শহরকে বাড়ানোর জন্য আশেপাশের ৩৫টি গ্রাম গ্রাস করবে।

নাগরি গ্রামে পাঁচিল তৈরি শুরু হলে কর্পোরেট মিত্তলদের জমি অধিগ্রহণ বিরোধী সফল লড়াইয়ের নেত্রী দয়ামণি বাড়লা এবং নির্দল বিধায়ক বন্ধু তিরকি নাগরিতে অবস্থানে বসে যান। সরকার পাঁচিল তুলতে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী নামায়। কিন্তু অবস্থানস্থল বিভিন্ন মানুষ ও রাজনৈতিক দলের উপস্থিতিতে ভরে ওঠে। এমনকী শাসক দলের নেতা শিবু সোরেন, শাসক দলের সহযোগী বিজেপিও অবস্থানকে সংহতি জানায়।

একদিন মানুষ পাঁচিলের একাংশ ভেঙে দেয়। কিছু লোক গ্রেপ্তার হয়। ২৫ জুলাই ধর্মঘট হয় ঝাড়খণ্ড জুড়ে, যার ব্যাপক সাড়া পড়ে রাঁচিতে।

খ ব রে দু নি য়া

ভূপালের গ্যাস বিপর্যয়ের নায়ক কর্পোরেট ডাউ কেমিক্যাল লন্ডন অলিম্পিকের স্পনসর

ভূপাল গ্যাস দুর্গতদের বিকল্প 'অলিম্পিক'

১৯৮৪ সালে মধ্যপ্রদেশের ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইডের সার ও কীটনাশক কারখানায় বিপর্যয়ে পঁচিশ হাজার মানুষ মারা যায়। এখনও সেই বিষে আক্রান্ত প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ। ক্ষতিপূরণ, দায় স্বীকার, শাস্তি তো দূরে থাক, ওই বিষ–কারখানার বিষাক্ত অবশেষগুলো অবধি সরিয়ে ফেলার বন্দোবস্ত করতে পারেনি সরকার বা সেদিনের ইউনিয়নের কার্বাইডের এখনকার মালিক ডাউ কেমিক্যাল। এবারের লন্ডন অলিম্পিকের প্রধান বিজ্ঞাপনদাতা এই কুখ্যাত কর্পোরেট। অলিম্পিকে যাতে এই কোম্পানিটির স্পনসরশিপ না থাকে তার জন্য দাবি তুলেছিলেন ভূপাল গ্যাস দুর্গতরা। কিন্তু সে দাবি কেউ শোনেনি। লন্ডন অলিম্পিক যেদিন শুরু হল, সেই ২৬ জুলাই ভূপালে দুর্গত মানুষরা অংশ নিলেন এক অভিনব 'অলিম্পিক'–এ। ছবি এএফপি–র তোলা।

চলতে চলতে

মানিকদার চায়ের দোকান

অমিতাভ সেন, ভবানীপুর, ৩০ জুলাই •

মানিকদার চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়ালে বোঝা যায় ডেকচিতে শুধু চায়ের জল ফোটে না। বোঝা যায় রাস্তার নাম দেবেন্দ্র ঘোষ রোড কেন। এখানে এই ছোট দোকানঘরে এসে সার্থক।

খুব ভিড়ের সময় এলাকার উঠতি মস্তান বাইক থেকে 'আমারটা' বলে হাঁক মারলে একবারও চোখ না তুলে 'সময় হলেই পাবে' বলে মোটরগাড়ি কারখানার বুড়ো ফিটার মিস্ত্রির হাতে গরমজলে ধোয়া ভাঁড়গুলো ধীরে ধীরে গুছিয়ে দেন। তারপর চায়ের কেটলির সাথে ফেরৎ খুচরো দিয়ে তাকে হিসেব বুঝিয়ে দেন।

রাত ঠিক ৯টার সময় বনেদি ঘরের বাবু খানদানি গলাটাকে একটু মিহি করে 'মানিক একটু চা হবে ভাই?' বললে মানিকদা অবিচলিত স্বরে 'দোকান বন্ধ হয়ে গেছে' ঘোষণা করে মহম্মদ রফির আধগাওয়া গানটার সাথে সাথে দোকান ধোয়া মোছার কাজ শেষ করতে থাকেন।

যে লোকটা কথায় কথায় খিস্তি দেয়, মানিকদার ভাই একবার দোকানে বসে তাকে ডেকে বাজার থেকে কিনে আনা তার হাতের মূলোর দর জিজ্ঞেস করায় সে একটা খারাপ কথা উচ্চারণ করেছিল। লোকটি চলে যাওয়ার পর ভাইয়ের মর্যাদাবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলে মানিকদা তাঁর ভাইকে প্রচণ্ড বকেছিলেন, 'কোন মানুষের সাথে কী কথা বলতে হয় শিখিসনি? তোকে দোকানে বসতে হবে না।'

খুব যত্ন করে চা করেন মানিকদা। প্রতিটা ভাঁড় একবার ঠান্ডা জল একবার গরমজলে ধুয়ে। চায়ে চিনি দিয়ে দুধ দিয়ে বার বার চামচেতে তুলে আরেকটা ভাঁড়ে ঢেলে টেস্ট করেন। তারপর হাত ধুয়ে মুছে তবে খদ্দেরের জন্য চা ঢালেন। কোনবার এর অন্যথা হয় না। শত ভিড়ের চাপ, খদ্দেরদের উশখুশ মানিকদার এই গোটা প্রক্রিয়াকে একটুও প্রভাবিত করে না।

গত ৩৮ বছর ধরে মানিকদার অকম্পিত স্বর একবার শুধু অনরকম শুনেছি। মোহনবাগানের প্রবল সমর্থক মানিকদাকে ইস্টবেঙ্গলের ৫ গোল দেওয়ার দিন সবাই যখন খোঁচাচ্ছিল তখন চায়ের দোকানের খাঁচার মধ্যে থেকে আহত সিংহের গর্জন শোনা গিয়েছিল, 'ইস্টবেঙ্গল ৫ গোল দেওয়ার মতো ভালো খেলে জিতেছে তো? ব্যস। আমি হার মেনে নিয়েছি। আর কোন কথা আছে কি?'

সম্প্রতি আরেকবার দুপুর ১২টা নাগাদ দোকান বন্ধ করার সময়ে 'আপনি এবেলার শেষ খদ্দের' বলে তিনি আমাকে চা এগিয়ে দিয়ে একটু দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, 'আমার বাবার সময়ে সন্ধ্যে ৭টায় দোকান বন্ধ হয়ে যেত। তাতেই একটা ঘরে আমাদের ৪–৫জনের দুধ–ভাত হয়ে যেত। এখন কী দিন পড়েছে। একটা ঘরে একজনকে নিয়েও চলে না। গড়িয়ার দিকে বাড়ি নিয়েও ছেড়ে দিয়েছি। কাউকে চিনি না। এখানে রাস্তায় বেরোলে সবাই চেনে, হাসে। ওখানে বউরা পাশের বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলবে কি, সবাই ভয়ে অস্থির, অচেনা জায়গা। আবার ভবানীপুরেই ফিরে এসেছি। খরচ খুব। খালি ভাবি আর আধঘন্টা দোকান চালালে আরেকটু কিছু হবে। আগে উত্তমকুমারের বই লাগলেই দোকান বন্ধ করে সিনেমা হলে ছুটতাম।' বলে ম্লান হাসলেন, তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'সিনেমাহলগুলোই বন্ধ হয়ে গেল সব। ছেলেমেয়েগুলো ঘরে এখন টিভি দেখে, বুঝলই না কীসব দিন চলে গেল।'

মোবাইল ফোন ব্যবহার নিয়ে
রায় কোচিং সেন্টার আয়োজিত আলোচনাসভায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের প্রশ্ন

- ব্লু টুথ বেশি করলে হাত কাঁপে কেন?
- মোবাইলের অপব্যবহার আটকানোর জন্য কোনো আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি?
- মোবাইলের বিকিরণ যে দেহের ডিএনএ–র ওপর খারাপ প্রতিক্রিয়া করে, তার ফলে ডিএনএ ক্ষতিগ্রস্ত হলে কি বিকলাঙ্গ বা মানসিক বিকৃতির কোনো সম্ভাবনা আছে?

অয়ন মুখার্জি, রণিত দত্ত, সোমনাথ দাস, সৌরভ দত্ত

(পরের সংখ্যায় এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেবেন শুভাশিস মুখোপাধ্যায়।)

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬, ই–মেল : manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18. Editor-Jiten Nandi, B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18.